

কোয়ান্টাম বুলেটিন

এপ্রিল ২০২০

সচেতন হোন | ইতিবাচক থাকুন

আমরা আছি আপনার পাশে

সচেতন হোন। আতঙ্কিত নয়, ইতিবাচক থাকুন। একটি সমস্যার পরিণতি সমাধান নাকি সংকটের দিকে মোড় নেবে, তা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দৃষ্টিভঙ্গি যদি হয় ইতিবাচক, তাহলে সমাধানের পথ একটা না একটা বেরিয়ে আসে। কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি যদি হয় নেতিবাচক, তখন ঘটে উল্টোটা। পুরো পরিস্থিতি হয়ে ওঠে সংকটাপন্ন, আরো জটিল।

বিশ্বজুড়ে যতটা না দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস, তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক-অস্থিরতা—যাতে আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সামগ্রিক পরিস্থিতি। তাই আতঙ্কিত হবেন না। আতঙ্ক ছড়াবেন না। অপপ্রচার থেকে সতর্ক থাকুন।

বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘পৃথিবীব্যাপী যত মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, সে তুলনায় অনেক বেশি মানুষ যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন—আমরা কিন্তু সেদিকে তাকাই না। আমরা শুধু দেখি কতজন মারা যাচ্ছে এবং সেটাই ভাইরাল হয়। সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে—আমি প্যানিক ছড়াতেও পারি, আমি প্যানিক কমাতেও পারি। একটা গ্লাসের আধা গ্লাস পানি; কেউ ভরাও দেখতে পারে, কেউ খালিও দেখতে পারে।’

(হেলথ সেমিনার অন করোনাভাইরাস, ড্যাফোডিল ইন্টা. ইউনিভার্সিটি, ২ মার্চ ২০২০)

বাস্তবতাও তা-ই। করোনা আক্রান্ত ৮০ শতাংশ রোগীই সুস্থ হয়ে উঠছেন ন্যূনতম জটিলতা ছাড়াই। আসলে কোনো ব্যাপারে সতর্কতা-সাবধানতা

অবলম্বন করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় অযাচিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে তুলি। তাই এসময় সবারই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন নিজের কর্তব্যের প্রতি। সর্বতোভাবে মেনে চলতে হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি।

এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ও সুস্থ থাকতে নিয়মিত ইয়োগা চর্চার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সেইসাথে উদ্বেগমুক্ত থাকতে তারা যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন, তার একটি হলো—একটু পর পর এসব সংবাদ দেখা আপনাকে দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন করে তোলে, তাই দিনে একবার কী দুবার নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করুন। (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অফারস টিপস ফর লিভিং আভার করোনাভাইরাস কোয়ারেন্টিন : ডোন্ট ড্রিংক, স্মোক অর ওয়াচ টু মাচ নিউজ; সিএনবিসি, ২১ মার্চ ২০২০)

তাই আসুন, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসরণ করি। নিজেরা সচেতন হই, অন্যকে সচেতন করি। সতর্ক হই, আতঙ্কিত নয়। গুজব বা নেতিবাচক খবর নয়, ছড়িয়ে দেই আশাবাদ—

করোনা আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষের সুস্থতার খবর জানিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করি। দুর্বোধ্য মোকাবেলায় পৃথিবীর যে-কোনো জাতির তুলনায় আমরা অধিকতর সক্ষম। চলুন, বর্তমান পরিস্থিতিও মোকাবেলা করি সম্মিলিত ইতিবাচকতার শক্তিতে। নিজেকে একা ভাববেন না, কোয়ান্টাম আছে আপনার পাশে। সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা জানতে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী-মনোবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ—

- ☐ সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবিধি মেনে চলুন।
- ☐ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।
- ☐ ধূমপানসহ সব ধরনের মাদক এবং চিনিযুক্ত পানীয় বর্জন করুন।
- ☐ প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ইয়োগা চর্চা করুন।
- ☐ উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মেডিটেশন ও প্রাণায়াম চর্চা করুন। নিজ ধর্মমতে প্রার্থনা করুন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো প্রার্থনা ও বিশ্বাসের শক্তি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত।
- ☐ বার বার এ-সংক্রান্ত সংবাদ জানতে ও দেখতে উদ্যোগী হবেন না। ভালো বই পড়া এবং এ ধরনের মননশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।
- ☐ বাড়িতে অবস্থানকালে পরিবারের সদস্যদের সাথে একাত্মতা বাড়ানো উদ্যোগী হোন।
- ☐ পরিবারের শিশুদেরকে আশ্বস্ত করুন—বেশিরভাগ রোগীই সেরে উঠছে।
- ☐ শিশুর একঘেয়েমি কাটাতে তার সাথে ঘরেই খেলায় মেতে উঠুন। বই পড়া, নতুন ভাষা শেখা ও লেখালেখির মতো সৃষ্টিশীল কাজে তাদের ব্যস্ত রাখুন। সারাদিন টিভি দেখে বা গেম খেলে সময় কাটাতে দেবেন না।
- ☐ সত্যিকার জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ফেসবুক টিভি স্মার্টফোন ইন্টারনেট থেকে সচেতনভাবে দূরত্ব বজায় রাখুন। এক বিপদ থেকে বাঁচতে গিয়ে অন্য বিপদ ডেকে আনবেন না।
- ☐ আশাবাদী ও ইতিবাচক থাকুন। সব ধরনের নেতিবাচক ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী খবর ও ভিডিও দেখা এবং প্রচার থেকে বিরত থাকুন। প্রাকৃতিক নিয়মে নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা সবার আগে আপনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

নোবেলজয়ী জৈব-পদার্থবিজ্ঞানী ড. মাইকেল লেভিট

অচিরেই করোনামুক্ত হবে বিশ্ব

নোবেলজয়ী জৈব-পদার্থবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাইকেল লেভিট সম্প্রতি বলেন, ‘অল্প কিছুদিনের মধ্যেই করোনামুক্ত হবে বিশ্ব।’

করোনা নিয়ে আগামী কয়েক মাস এমনকি বছরজুড়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সতর্কবাণী দিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীব্যাপী রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ড. লেভিটের মতে, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন যা দরকার সেটা হলো আতঙ্কটা নিয়ন্ত্রণ করা।’

করোনার কারণে চীনে যখন মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল, সে-সময়ে প্রফেসর লেভিট আশার কথা শুনিয়েছিলেন—‘আগামী সপ্তাহ থেকেই এটা কমতে শুরু করবে।’ সত্যিই ঘটেও ছিল তা-ই।

তথ্যসূত্র : লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, ২৩ মার্চ ২০২০

মনে মনে শতবার বলুন : সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

অন্যান্য ফ্লু-র তুলনায় করোনা কতটা ভয়ংকর?

পৃথিবীজুড়ে অধিকাংশ মিডিয়া যখন করোনার আতঙ্ক প্রচারে ব্যস্ত, সাধারণ মানুষও যার ভয়ে গৃহবন্দি জীবনযাপন করছেন, তখন সাধারণ ফ্লু-র সাথে সেই প্রবল পরাক্রান্ত (!) করোনাকে তুলনা করা দুঃসাহস বটে! কিন্তু করোনাভাইরাস আসলেই তার জাতভাই অন্যান্য ফ্লু-র চেয়ে কতটা প্রাণঘাতী, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বৈকি। আসুন, বিষয়টি যাচাই করি নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে।

করোনা কি সদ্য আসা এলিয়েন?

মোটাই না! ফ্লু-র সময়ে যে ভাইরাসগুলোর সংক্রমণে সর্দি-কাশি জ্বর হয়, তাদের খুব পরিচিত একটি গ্রুপের নাম করোনা। এ গ্রুপের সবগুলো ভাইরাসই বিধ্বংসী নয়, কয়েকটি প্রজাতি বিধ্বংসী। করোনা গ্রুপের বিখ্যাত (নাকি কুখ্যাত!) ভাইরাসগুলোর মধ্যে রয়েছে MERS, SARS, OC43, HKU1, NL63, 229E. প্রথম দুটি বিশ্বব্যাপী অধিক পরিচিত। পরের চারটি প্রতি বছর মানবজাতিতে সামান্য জ্বর-সর্দিতে ভোগায়। তাহলে সপ্তম করোনাভাইরাস SARS-CoV-2 থেকে সৃষ্ট COVID-19 রোগ কেন পৃথিবীব্যাপী মানুষকে গৃহবন্দি করতে সক্ষম হলো, তা একটা প্রশ্ন বটে!

২০১৯-এর ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম COVID-19 রোগ বা করোনার নতুন এই জাত শনাক্ত হয়। তবে এর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হতে পারেন নি। করোনা আক্রান্ত হলেই যে মানুষ মারা যায় তা নয়। অন্যান্য ফ্লু-র মতো জ্বর, সর্দি-কাশি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। যারা এখন পর্যন্ত মারা গেছে তারা প্রায় সবাই করোনার পাশাপাশি এক বা একাধিক ক্রনিক কিংবা বার্ষিকজনিত রোগে আক্রান্ত ছিল।

করোনা এ পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী আক্রান্ত হয়েছে মোট ৮,৫৮,৩১৯ জন। এর মাঝে মারা গেছেন ৪২,৩০২ জন। আর সুস্থ হয়েছেন ১,৭৭,৯৩১ জন। অর্থাৎ এ ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার ৪.৯৩%। আর পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ২০.৭৩%। বর্তমান আক্রান্তদের মাঝে মৃদু অসুস্থতা বোধ করছেন ৯৫%।

করোনা কেন জর্জরিত ইতালি ও স্পেন?

সারা বিশ্বে করোনা যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, তার অর্ধেকেরও বেশি ইতালি ও স্পেনের নাগরিক। চীনে করোনা আক্রান্তদের ৪% মারা গেছে। চীনের নিকটবর্তী দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তদের ১.৬৬% আর ইতালির নিকটবর্তী জার্মানিতে ১.০৮% মারা গেছে। পক্ষান্তরে ইতালিতে ১১.৭৫% ও স্পেনে ৮.৮২% করোনা আক্রান্ত মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ এ দুটি দেশে করোনা মৃত্যুহার অনেক বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর প্রথম কারণ করোনার প্রাদুর্ভাব ঘটায় পর চীন ও জার্মানি খুব দ্রুত শক্ত পদক্ষেপ নিলেও ইতালি ও স্পেন বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নেয় নি। তাদের তৎপরতা শুরু হয় ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। ততক্ষণে সর্বনাশের বীজ চারাগাছ হয়ে ভালপালা মেলতে শুরু করেছে।

দ্বিতীয়ত, করোনা প্রাথমিকভাবে মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। শুধু করোনা নয়, পৃথিবীজুড়ে প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য ফ্লু-তে মারা যায় ২,৯০,০০০ থেকে ৬,৫০,০০০ মানুষ। এর বড় অংশই পাকাত্যের নাগরিক এবং অধিকাংশের বয়সই ৬৫-এর বেশি। বার্ষিকজনিত কারণে ও বিভিন্ন ক্রনিক রোগে (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, অ্যাজমা-ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদিতে) আক্রান্ত হওয়ায় যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, মৌসুমি ফ্লু-র সহজ শিকার হয় তারা। যে-কারণে ইতালিতে করোনাজনিত কারণে মৃতদের ৮৫%-এর বয়সই ৭০-এর বেশি। স্পেনেও একই অবস্থা।

তৃতীয় কারণ হলো, ইতালি ও স্পেনের সামাজিক রীতি অনুযায়ী প্রতি রবিবার তরুণরা তাদের দাদা-দাদি, নানা-নানিদের সাথে দেখা করে ও একসাথে চাচ্ছে যায়। এভাবে করোনা ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। (সিএনবিসি, ২৭ মার্চ ২০২০)

তবে আশার কথা হলো, ইউরোপের দেশগুলো বাদ দিলে অধিকাংশ দেশে অন্যান্য ফ্লু-র তুলনায় করোনার আক্রমণ ও প্রকোপ দুটোই কম। আসুন পাশের তালিকা দেখে নিই। আপনি নিজেই তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, সাধারণ ফ্লু-র চেয়ে করোনা কতটা ভয়ংকর।

তথ্যসূত্র : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনফেকশাস ডিজিজেস, ভলিউম ৮৮, নভেম্বর ২০১৯; জার্নাল অব প্রিভেন্টিভ হাইজিন, মার্চ ২০১৬; দ্য অটিলান্টিক, ২০ মার্চ ২০২০ (www.worldometers.info/coronavirus/#countries, ৩১ মার্চ ২০২০)

ইনফ্লুয়েঞ্জা-জনিত রোগ

করোনা
(৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত)

যুক্তরাষ্ট্র

- ২০১৭-১৮ মৌসুমে আক্রান্ত সাড়ে চার কোটি। হাসপাতালে ভর্তি ৮,১০,০০০ ও মারা যায় ৬১,০০০ জন।
- ২০১৮-১৯ সালে আক্রান্ত সাড়ে তিন কোটি। হাসপাতালে ভর্তি ৮,৯০,৬০০ জন। মারা যায় ৩৪,২০০ জন।

সূত্র : এন্টিমিটেড বার্ডেন অব ইনফ্লুয়েঞ্জা: সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, যুক্তরাষ্ট্র

আক্রান্ত : ১,৮৮,৫৩০ জন
মৃত : ৪,০৫৩ জন
মৃত্যুর হার : ২.১৫%

যুক্তরাজ্য

- প্রতি বছর ইংল্যান্ডে মারা যায় গড়ে ১৭,০০০ মানুষ। ২০১৪ সালে ২৮,৩৩০ জন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

সূত্র : সার্ভাইল্যান্স অব ইনফ্লুয়েঞ্জা ২০১৮-১৯, পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড

আক্রান্ত : ২৫,১৪৫০ জন
মৃত : ১,৭৮৯ জন
মৃত্যুর হার : ৭.১১%

ফ্রান্স

- ফ্রান্সে প্রতি বছর সিজনাল ফ্লু-তে আক্রান্ত হয় প্রায় ২০-৬০ লাখ মানুষ।
- ২০১৬-১৭ সালে ১৪,৪০০ ও ২০১৭-১৮ সালে প্রায় ১৩,০০০ মানুষ ফ্লু-তে মারা গেছে। ২০১৯ সালেও ফ্লু-তে মারা গেছে সাড়ে নয় হাজার ফরাসি।

সূত্র : দ্য কান্ট্রিয়ান, ২১ মার্চ ২০২০

আক্রান্ত : ৫২,১২৮ জন
মৃত : ৩,৫২৩ জন
মৃত্যুর হার : ৬.৭৬%

ইতালি

- ইতালিতে ফ্লু-জনিত রোগে মৃত্যুর হার অন্য দেশগুলোর চেয়ে এমনিতেই অনেক বেশি। ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ ফ্লু-র মৌসুমে ইতালিতে আক্রান্ত হয় প্রায় ৫২,৯০,০০০ মানুষ। মারা গেছে ৬৮,০৬৮ মানুষ। অর্থাৎ প্রতি বছর ফ্লু-তে মৃত্যুবরণ করে গড়ে ১৭ হাজার ইতালিয়ান।
- অক্টোবর ২০১৯ থেকে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ফ্লু-তে আক্রান্ত প্রায় ২৭,৬৮,০০০। জানুয়ারিতে সাত দিনে মারা যায় ২৪০ জন।

সূত্র : দ্য লোকাল, ২৩ জানুয়ারি ২০২০

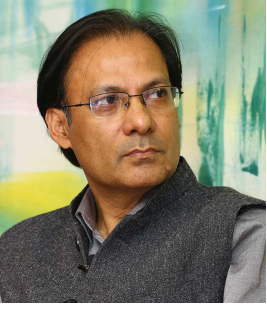
আক্রান্ত : ১০৫,৭৯২ জন
মৃত : ১২,৪২৮ জন
মৃত্যুর হার : ১১.৭৫%

ভারত

- ২০১৭-তে সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছে ৩৮,৮১১ জন। মারা গেছে ২,২৭০ জন।
- ২০১৮-তে আক্রান্ত হয়েছে ১৫,২৬৬ জন। মারা গেছে ১,২১৮ জন।
- ২০১৯-এ আক্রান্ত হয়েছে ২৮,৭৯৮ জন। মারা গেছে ১,১২৮ জন।

সূত্র : ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (ভারত)

আক্রান্ত : ১,৩৯৭ জন
মৃত : ৩৫ জন
মৃত্যুর হার : ২.৫১%



সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ আর ভালবাসা দিয়েই দুর্যোগ জয় করতে হবে শাহাদুজ্জামান

স্মরণ রাখা প্রয়োজন—রোগ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ, কিন্তু মহামারি একটি সামষ্টিক অভিজ্ঞতা। মহামারি পুরো জনগোষ্ঠীর যৌথ অভিজ্ঞতার বিষয় বলে এ শুধু রোগতত্ত্বের ব্যাপার নয়, এটি সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতিরও ব্যাপার। জনস্বাস্থ্যবিদ্যা আমাদের জানায়, মহামারির এই সব জীবাণু নিরীহ হয়েই বসে থাকে নানা প্রাণীর শরীরে—বাদুড়ে, হাঁদুরে। কেবল মানুষের শরীরে এলেই কখনো কখনো বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে তা হয়ে ওঠে ভয়ংকর।

প্রাণিদেহের জীবাণু মানবদেহে আসার সুযোগ পায় বস্ত্ত মানুষের অনিয়ন্ত্রিত নানা আচরণের ফলে; এবং তা নির্ধারিত হয় নানা রাজনীতি, অর্থনীতির চোরাগলি ধরেই। চীনের উহান শহরের যে প্রাণিবাজার থেকে এই বিশেষ করোনা জীবাণুর সূত্রপাত, সেখানে বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত প্রাণী পালনের ও নিধনের উৎসব চলে। চলে কৃত্রিম প্রাণী উৎপাদন। সারা পৃথিবীতে সুলভে, দ্রুত ও ব্যাপক হারে পণ্য সরাবরাহ চীনকে অর্থনৈতিক পরাশক্তিগত পরিণত করেছে বটে, কিন্তু বিপুল মুনাফার উত্তেজনায় পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি নিরাময়ের ভারসাম্যে অবধারিতভাবে ক্রটি ঘটছে কোথাও। বন্যপ্রাণী আর মানুষের সংযোগের গ্রহণযোগ্য মাত্রার দেয়াল ধসে গেছে উহানে। সেই সুযোগে জীবাণু তার পথ করে নিয়েছে মানুষের শরীরে। করোনা মহামারি সূত্রপাতের প্রারম্ভেই তাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উহান বাজার।

অতীতের নানা মহামারির তুলনায় করোনা মহামারির মৃত্যুঘাতী প্রবণতা কম হলেও এর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যাবতীয় অর্জন, সর্বোচ্চ প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও উন্নত অর্থনীতির দেশের পক্ষেও এই মহামারিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাপকতা সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে। ফলে আতঙ্কের হাওয়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বিভিন্ন

অঞ্চলে, নানা দেশে। সেই হাওয়া হানা দিয়েছে বাংলাদেশেও। মহামারি যে অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের জন্ম দেয়, তাতে সুযোগ তৈরি হয় গুজব রটনাকারীদের, মুনাফালোভীদের। কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রেখে স্থির মস্তিষ্কে স্থানীয় পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই এখন জরুরি। এখন প্রয়োজন হলো মহামারিতে নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা। সবার বোঝা জরুরি যে, এই স্বাস্থ্যবিধি শুধু নিজের স্বার্থে নয়, অন্যের স্বার্থেও।

এই মহামারি মানুষ মোকাবেলা করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু করোনা মহামারি আমাদের আবারও কতগুলো সত্যের মুখোমুখি করুক। মহামারি আমাদের জানাক যে, আমাদের সবার ব্যক্তি অস্তিত্ব আসলে জড়িয়ে আছে সামষ্টিক স্বার্থের সঙ্গে। একটি সংকট যখন সর্বমানবিক হয়ে ওঠে, তখন তার সমাধানও আসতে হবে সর্বমানবিক যৌথ চেষ্টাতেই। আমাদের মনে পড়ুক পল রবসনের সেই গান, ‘উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার’।

সঙ্গরোধ (কোয়ারেন্টিন) আমাদের বুঝতে সাহায্য করুক, মানুষের জন্যে মানুষের সঙ্গের হাছাকার কত গভীর। মহামারি আমাদের ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করুক আদি অকৃত্রিম প্রকৃতির দিকে। সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিক যে, প্রকৃতির কাছে মানুষ এখনো খুবই নাজুক। ফলে আমরা যেন নতুন করে ভাবতে বাধ্য হই বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রকৃতির দাবি সাংঘর্ষিক হয়ে উঠছে কিনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যাহতির ঠিক পরই আলবেনিয়ার কাম্যু লিখেছিলেন তার উপন্যাস *দ্য প্লেগ*। মহামারির অসহায়ত্বকে

খুঁড়ে তিনি এই মহাকালের ভাবনাতেই তাড়িত করেছেন সবাইকে যে, একটা দুর্যোগ যখন কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে আসে, সে-সময় তা জয় করা যায় শুধু সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ আর ভালবাসা দিয়েই।

দৈনিক প্রথম আলোতে ‘মহামারি মহাকাল’ শিরোনামে প্রকাশিত (২০ মার্চ ২০২০) কথাসাহিত্যিক ও বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষক শাহাদুজ্জামানের একটি নিবন্ধের নির্বাচিত অংশ।

প্রকৃতি ভালো থাকলে ভালো থাকব আমিও

গৃহবাসী মানুষ ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। বন্যপ্রাণীর আক্রমণ, অতিবৃষ্টি, খরা, তীব্র শীত—এমনই নানা দুর্যোগ আর রহস্যে ঘেরা প্রকৃতিতে টিকে থাকাই ছিল মানুষের লক্ষ্য। সময়ের আবর্তে জগতের গতি-প্রকৃতি বুঝতে শুরু করল মানুষ, ভেদ করতে লাগল রহস্যের জাল। জানা-বোঝার এ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে রূপ নিল সম্ভাব্য সবকিছুকে হাতের মুঠোয় নেয়ার অদম্য স্পৃহায়। একসময় নিয়ন্ত্রণ করার তাড়না পরিণত হলো সর্বব্যাপী জিঘাংসায়।

অরণ্য উজাড় করে, পাহাড় চূর্ণ করে, খাল-বিল-নদী-জলাশয় ভরাট করে গড়ে উঠছে একের পর এক লোকালয়। মানুষের লাগামহীন ক্ষুধার জোগান দিতে নির্বিচারে প্রাণী নিধন চলছে। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী *নিউ সায়েন্টিস্ট*-এ (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০) প্রকাশিত হয় ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের একটি জরিপ—

অঞ্চল	মাংসের চাহিদা (১৯৬০ সাল)	মাংসের চাহিদা (২০১০ সাল)
ইউরোপ	৩ কোটি টন	প্রায় ৫ কোটি টন
সেন্ট্রাল ও সাউথ আমেরিকা	১ কোটি টনের কম	সাড়ে ৪ কোটি টন
নর্থ আমেরিকা	২ কোটি টনের কম	৪ কোটি টন
আফ্রিকা	৫০ লক্ষ টন	২ কোটি টন
চীন	১০ লক্ষ টনের কম	প্রায় ৯ কোটি টন
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৫০ লক্ষ টন	প্রায় ৫ কোটি টন

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং মানুষের লোভ ও রসনার ক্রমবর্ধমান গতিই এর কারণ। দুই দশক আগেও আমাদের দেশে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে মাংস খাওয়া হতো সপ্তাহে দু-একবার। অথচ এখন প্রায় সব পরিবারে প্রতিদিনই খাবার টেবিলে থাকে মাংসের জোগান। উপরন্তু ব্যতিক্রমী সব স্বাদ নিতে মানুষের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ছে না ক্ষতিকর হিংস্র প্রাণী, সরীসৃপ এমনকি কীটপতঙ্গও। মনে রাখা প্রয়োজন, খাদ্য থেকে মানবদেহে শুধু পুষ্টি উপাদানই আসে না, আক্রান্ত প্রাণীর রোগ-জীবাণুও খুঁজে নেয় বিস্তারের সহজ পথ।

সেইসাথে রয়েছে অতিপুষ্টি, মেদস্থূলতা এবং এ-সংক্রান্ত রোগব্যধি। আধুনিকতার মোড়কে এ এক দৃষ্টান্ত—প্রথমে দেহের স্বাভাবিক ওজন ও গড়নকে নষ্ট করা, তারপর প্রায় চোখের নিমেষে তা পুনরুদ্ধারের আশায় চলে নানাবিধ ডায়েট, যন্ত্রসহায়ক ব্যায়াম এমনকি সার্জারি। ফলে ওজন মাপা মেশিনে প্রত্যাশিত ডিজিট ভেসে উঠলেও মানুষ হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এভাবেই আজ জীবনের প্রতিটি বাঁকে মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ-অভ্যাস।

খাদ্যসহ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে জলস্থলে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে বহু প্রাণী, লতা-গুল্ম-বৃক্ষ; ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমগ্র প্রকৃতি। অথচ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, আমি মহাবিশ্বের কোনোকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি। ... *[সূরা সাদ : ২৭]*

এ সত্যটিই উপলব্ধি করতে হবে—সকল প্রাণের অস্তিত্বের ওপরই নির্ভর করে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, বিশ্বজনীন মমতার স্বাদ যে পেয়েছে, সে সকল প্রাণের মাঝেই নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। *[যজুর্বেদ : ৪০.৬]* তাই লোভ আর চোখের ক্ষুধার সীমারেখা টানতে হবে নিজেকেই। অভ্যস্ত হতে হবে সুস্থ-সুখম প্রকৃতিবান্ধব জীবনচায়ে। ‘আমি’-র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে হতে হবে ‘আমরা’। শুধু নিজেকে নিয়েই ভালো থাকব—এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে বিশ্বাস করতে হবে—প্রকৃতি ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকব।

ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে দেহের অদৃশ্য সেনাবাহিনী, চারপাশের লক্ষ কোটি ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে যা আমাদের সুরক্ষিত রাখে। রাখে সুস্থ, তারুণ্যদীপ্ত ও রোগ-ঝুঁকিমুক্ত।

আর এই দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত ও সংহত করে তুলতে চাই আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা। দৈনন্দিন জীবন-অভ্যাসে ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে করে তুলতে পারে অধিকতর কার্যকরী।

প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে কার্যকর প্রতিরক্ষা

প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন। কার্যকর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক এটি। বলা যায়, শক্তিমত্তা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি বড় উৎসই হলো বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাচার।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, মেডিটেরেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভ্যাস এ-ক্ষেত্রে ধন্বন্তরী। ১৫ লক্ষ মানুষের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এ খাদ্যাভ্যাস করোনারি হৃদরোগ এবং অকালমৃত্যুর হার কমায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচলিত খাদ্যতালিকায় রয়েছে মূলত মৌসুমি ফলমূল, শাকসবজি, সালাদ, হোল গ্রেইন বা পূর্ণখাদ্যশস্য (লাল চাল ও আটা ইত্যাদি), বাদাম, ডাল-শিম-বিজ-মটরগুটি জাতীয় খাবার, টক দুই এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, সামুদ্রিক মাছ, চর্বিহীন মাংস (ন্যানতম)। রেড মিট (গরু খাসি পাঁঠার মাংস), স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা ক্ষতিকর সম্পৃক্ত চর্বি এবং লবণ ও চিনির পরিমাণ এতে অতি সামান্য। সেইসাথে প্রক্রিয়াজাত-প্যাকেটজাত খাবারের পরিমাণ একেবারে শূন্য!

রঙিন ফলমূল ও শাকসবজিতে নীরোগ দেহ

রঙিন ফলমূল-শাকসবজি থেকে যে পুষ্টিবেচিহ্ন আমরা পাই, এককথায় তা অতুলনীয়। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিদিন পাঁচ থেকে নয় প্রকারের ফল ও শাকসবজি খান। এর পর্যাপ্ত ভিটামিন বি, সি এবং অন্যান্য ভিটামিন-মিনারেল, আঁশ ও বার্ব্যাক-প্রতিরোধী এন্টি-অক্সিডেন্ট বাড়াবে আপনার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। সুস্থ থাকবেন আপনি।

প্রত্যেক ভিন্ন রংবিশিষ্ট ফল-সবজির মধ্যে রয়েছে দারুণ সব স্বাস্থ্য-হিতকর উপাদান। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো—দৈনন্দিন খাবারে ফল-সবজির রংধনু সাজান। প্রাকৃতিক এই খাদ্যসম্ভার দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে করবে অধিকতর শক্তিশালী। তবে এসব খাবার যত কাঁচা এবং অর্ধসেক্ষ অবস্থায় খাওয়া যাবে, কার্যকারিতার সম্ভাবনাও তত বেশি।

লাল: টমেটো, তরমুজ, ডালিম, স্ট্রবেরি, আপেল, লাল মূলা ও শালগম, লাল বাঁধাকপি, লাল কিডনি বিন, গোলমরিচ ইত্যাদি। এ ধরনের খাবারে রয়েছে লাইকোপিন ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা প্রোস্টেট ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, দেহভাঙনের ডিউমার ও উচ্চ কোলেস্টেরলের ঝুঁকি হ্রাস করে। ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিকেলের বিনাশ ঘটায়। অর্থাৎ রোগীদের ক্ষেত্রে অস্থিসন্ধির প্রদাহ কমায়।

কমলা ও হলুদ: আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, কলা, কামরাঙা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ভুট্টা, স্কোয়াশ ইত্যাদি। প্রচুর বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন এ এবং পটাশিয়াম পাওয়া যায় এসব খাবারে।

সুখম খাদ্যাভ্যাসে বাড়ান আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা



সাদা: মাশরুম, ফুলকপি, সাদা মূলা ও শালগম, রসুন ইত্যাদি। এ রংয়ের ফল-সবজিগুলো দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দারুণ উদ্দীপ্ত করে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক এবং ক্যান্সার প্রতিরোধী ন্যাচারাল কিলার সেলের (বি ও টি সেল) কর্মক্ষমতা বাড়ায়। ফলে অন্ত্র, স্তন, প্রোস্টেট ও হরমোনজনিত ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। ঘন ঘন জ্বর, সর্দি, ফু ও ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা আছে যাদের, তাদের জন্যে সাদা রংবিশিষ্ট ফল-সবজি বেশ উপকারী।

সবুজ: পালংসহ নানা ধরনের শাক, লেটুস, লাউ, বাঁধাকপি, মটরগুটি, করলা ইত্যাদি। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখে বলে এগুলো ঘুরেফিরে খাওয়া দরকার প্রতিদিনই। পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম আয়রন রয়েছে এসব খাবারে। হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। আরো আছে চোখের জন্যে উপকারী 'লুটিন' ও 'জিয়াক্স্যান্থিন'। মনে রাখতে হবে, সবুজ পাতায়ুক্ত শাকসবজির রং যত গাঢ় হবে পুষ্টি ও উপকারিতাও মিলবে তত বেশি।

নীল ও বেগুনি: জাম, কিশমিশ, রঙিন আঙুর, পেঁয়াজ, বেগুন, বিট ইত্যাদি। হজমশক্তি বাড়ায়। পরিপাকতন্ত্রের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। বয়সজনিত স্মৃতিশ্রুতির ঝুঁকি কমায়। বার্ব্যাকগতিকে ধীর করে। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ-ঝুঁকি কমায়।

লেবু-পানিতে দেহক্ষয় রোধ

প্রতিদিন সকালে লেবু-পানি পান করুন। দিনের শুরুতেই আধা লিটার হালকা গরম পানিতে একটি লেবুর রস (পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্যে) মিশিয়ে পান করলে তা সারাদিনের জন্যে আপনার হজম-প্রক্রিয়াকে প্রস্তুত করে। বিপাকক্রিয়াকে করে ত্বরান্বিত। দেহ-সুরক্ষা ব্যবস্থাকেও চাঙ্গা করে তুলতে এ এক মোক্ষম দাওয়াই। তবে তা পান করতে হবে সকালের নাস্তার অন্তত ১৫/২০ মিনিট আগেই।

ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা ও সর্দি প্রতিরোধ-প্রতিকারে তো বটেই; এর পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়া-প্রতিরোধী ভূমিকার কারণে যে-কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধেই (শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, গলা ব্যথা, টনসিলের প্রদাহ

ইত্যাদি) এটি হতে পারে দৈনন্দিন প্রতিকার ব্যবস্থা।

মানবদেহে অল্প-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষায় লেবুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিনের শুরুতে তাজা ঈষদুষ্ণ লেবু-পানি দেহে সঠিক পি-এইচ মান বজায় রাখে। ফলে দেহের উপকারী অণুজীবগুলো (নরমাল ফ্লোরা) থাকে অক্ষত ও কার্যকর।

উল্লেখ্য, যারা পাকস্থলির আলসার বা এ জাতীয় সমস্যায় ভুগছেন তারা সকালে খালি পেটে লেবু-পানি পানের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় পরিবেশ রক্ষা জরুরি

দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ কার্যকর থাকে, যখন দেহে বজায় থাকে অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থা। এসিডিক পরিবেশে দেহে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার দৌরাভ্য বাড়ে, অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় পরিবেশে ওরা পড়ে সমূহ বিপদে।

দেহে ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করুন। কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি, যা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান দেহকোষে পৌঁছে দেয়। টক্সিন, দূষিত ও বর্জ্য পদার্থ ধুয়ে-মুছে শরীর থেকে বের করে দেয়। পর্যাপ্ত পানি পান মুখ-গহ্বরকে আর্দ্র ও সিক্ত রাখে। ঠাণ্ডা-সর্দির প্রকোপ কমায়।

চিনি, ভাজাপোড়া-মশলাদার, মিষ্টি জাতীয় ও প্রক্রিয়াজাত খাবার বর্জন করুন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এসিডিক অবস্থা কেটে গিয়ে দেহে সৃষ্টি হবে অ্যালকালাইন পরিবেশ। দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও হয়ে উঠবে চনমনে।

যা বর্জনীয়

কার্যকর দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে যেমন দরকার সচেতন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা, তেমনি রয়েছে কিছু বর্জনীয়ও—যেমন: ভুল খাদ্যাভ্যাস, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ, হতাশা-বিষমতা, অপরিপাক্য ঘুম, পরিশ্রমহীন জীবনচারণ, মেদস্থলতা, ধূমপানসহ সব ধরনের মাদক ও অ্যালকোহল, কোমল পানীয়, মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন ইত্যাদি।

নিয়মিত মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা আপনাকে রাখবে সুস্থ, প্রশান্ত ও কর্মোদ্যমী

আধুনিক মানুষের দিন কাটে নানাবিধ অস্থিরতায়। আর অস্থির মন সবসময় অতীতের ভুলভ্রান্তি অথবা ভবিষ্যতের আশঙ্কার মধ্যে ঘুরপাক খায়। অথচ প্রতিটি মানুষের দেহ আগামীকাল কেমন হবে, তা নির্ভর করে বর্তমানের চিন্তার ওপর। তাই প্রতিদিনের চিন্তার প্রতি নজর দিতে হবে। সুস্থ থাকার জন্যে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা—এটি শুধু দৈহিক বিষয় নয়, মনের সাথেও এর রয়েছে সরাসরি সংযোগ। মানুষের চিন্তা ও ধ্যানধারণাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পৌঁছে যায় তার দেহের প্রতিটি কোষে এবং দেহ-মনের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাই একে সুসংহত করার জন্যে নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং উজ্জীবিত হতে হবে বিশ্বাস ও আশাবাদে। বিশ্বাসের শক্তিকেই বাড়ানোর পরীক্ষিত উপায় হলো মেডিটেশন বা ধ্যান।

গবেষক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যা বলছেন

যুক্তরাষ্ট্রের জস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের মতে, প্রতিদিন ৩০ মিনিট মেডিটেশন চর্চার মধ্য দিয়ে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকর্ষা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সহজেই। উল্লেখ্য, যে-কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। (হাফিংটন পোস্ট, ৬ ডিসেম্বর ২০১৭)

এদেশের প্রয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের ভাষায়, ‘শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। মনের শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, এমনকি রোগ নির্মূল করে।’

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ‘বডি, মাইন্ড, স্পিরিট’ সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধের মূল কথাই ছিল—সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এই সহজাত ক্ষমতার সাথে নিজের বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করলে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ খরচই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের মাইন্ড বডি ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ও হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেন, শিথিল হতে শুরু করলেই আপনার শরীর ১৮০ ডিগ্রি মোড় নেয়, উত্তেজনা থেকে পুনর্নির্মাণের স্তরে ফিরে যায়। পেশি শিথিল হয়ে যায়, দম ধীর হয়, বিপাকক্রিয়া ও রক্তচাপ কমে যায়।

অর্থাৎ শিথিলায়ন বা ধ্যানাবস্থায় দেহ তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতেই সে প্রতিহত করে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাস।

সেইসাথে নিয়মিত ইয়োগা চর্চা দেহ-মনকে প্রশান্ত করে, উচ্চ রক্তচাপ ও দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

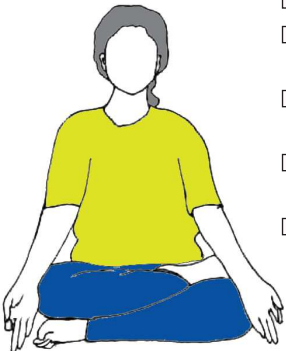
নরওয়ের একদল গবেষক একটি ব্যতিক্রমী গবেষণা পরিচালনা করেন। দুই ঘণ্টাব্যাপী ইয়োগা ও প্রাণায়ামের সেশনে অংশ নেয়ার আগে ও পরে ১০ জন ব্যক্তির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায়, ইয়োগা ও প্রাণায়াম করার পর তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধী কোষগুলোর তৎপরতা বেড়েছে বহুগুণে। (ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯)

তাই ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও সুদৃঢ় রাখতে নিয়মিত মেডিটেশন ও ইয়োগা চর্চা করুন। সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকুন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকটি অভ্যাস :

- শোকরগোজার হোন।
- ভালো ও ইতিবাচক কথা বলুন। পারস্পরিক কথাবার্তায় সুন্দর শব্দ ব্যবহার করুন।
- দৈনন্দিন কাজের একটি রুটিন করুন। বিশেষত খাওয়া ও ঘুমের জন্যে নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করুন।
- আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসুন। সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকুন।
- প্রার্থনায় লীন হোন। প্রার্থনার শক্তি রোগ-শোক ও হতাশাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মেডিটেশন অডিও ফ্রি ডাউনলোড করুন :
publication.quantummethood.org.bd



এ সময়ের জন্যে উপকারী কিছু কোয়ান্টাম ইয়োগা



গোমুখাসন
মানসিক ও স্নায়বিক
উত্তেজনা দূর হয়।
রাতে ঘুমানোর
আগে এ আসন
করলে অনিদ্রা ও
অস্থিরতা দূর হয়।



প্রাণায়াম

প্রাণায়ামের ফলে ফুসফুসে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করে। ফলে কোনো রোগ সহজে ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে না। মাইগ্রেন নিরাময়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শশাঙ্গাসন

টনসিলের সমস্যা দূর
করে। ঘন ঘন ঠাণ্ডা
লাগা দূর হয়।



উষ্ট্রাসন

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের
কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি
করে। এড্রিনাল
গ্রন্থিতে পর্যাপ্ত
পরিমাণে রক্ত
চলাচল করিয়ে
শরীরকে সুস্থ ও
কর্মক্ষম রাখে।



পবনমুত্তাসন

হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের
জন্যে উপকারী।



হলাসন

টনসিলের সমস্যা দূর হয়। পরিপাকতন্ত্রের
ক্রিয়াকলাপকে গতিশীল করে। মেরুদণ্ডে
স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

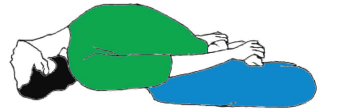
ভুজঙ্গাসন

ব্যাকপেইন দূর করে। যারা
ঘন ঘন ঠাণ্ডায় ভোগেন
তাদের জন্যে উপকারী। হাই
ব্লাডপ্রেশার, মানসিক উদ্বেগ ও
উত্তেজনা কমায়।



সর্বাঙ্গাসন

থাইরয়েড,
প্যারাথাইরয়েড
ও টনসিলে রক্ত
চলাচল বাড়ে।
শরীরকে রাখে
সতেজ ও সুস্থ।



মৎস্যাসন

ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়ায়।
হাঁপানি সর্দি কাশি ব্রঙ্কাইটিস
টনসিলের রোগীরা উপকৃত হবেন।

স্বরায়ন

এ আসনে গলার
স্বর সুন্দর ও
আকর্ষণীয় হয়।
টনসিলের জন্যে
বিশেষ উপকারী।



বিস্তারিত—
yoga.quantummethood.org.bd

প্রশ্ন : গুরুজী, টিভি-সংবাদপত্র সবখানে একটাই কথা—করোনা। সবাই আতঙ্কিত। করণীয় কী?

উত্তর : ভয়ভীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, শুদ্ধাচারী হোন। ফেসবুকসহ নানা মাধ্যমে যেসব গুজব-অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে, তা নিজে দেখবেন না। কারো সাথে শেয়ার করবেন না। একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়তে দেখলাম, এসব যারা ছড়াচ্ছে তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘ইবলিসের বরপুত্র’ বলে!

বাস্তবতা হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে করোনা আক্রান্ত ৮০%-এর বেশি রোগীই সেরে উঠছেন কোনো জটিলতা ছাড়াই। হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছেও যেতে হচ্ছে না! এ-ক্ষেত্রে সাধারণ ফ্লু-র মতোই পর্যাপ্ত বিশ্রাম, ভিটামিন সি ও পুষ্তিকর খাবার গ্রহণ এবং ঘরোয়া চিকিৎসাই যথেষ্ট।

জটিলতা হচ্ছে কাদের? বার্বাকজনিত অসুস্থতা ও বিভিন্ন ক্রনিক রোগে যারা ভুগছেন, তাদের। এর বাইরে করোনাজনিত অসুস্থতায় রিকভারি রেট অনেক বেশি। এ ভাইরাসের আক্রমণ প্রথম ঘটে চীনে। সেখানে তো ১০ জন আক্রান্তের নয় জনই সুস্থ হয়ে গেছেন এবং সুস্থতার হার ৯২%। কিন্তু পরিস্থিতিতে ভীতিপ্রদ করে তুলেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্রেকিং নিউজ—কোথায় কতজন মারা গেল! অথচ পৃথিবীজুড়ে প্রতি বছর ফ্লু-জনিত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে এমনিতেই ২,৯০,০০০ থেকে ৬,৫০,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে! (জার্নাল অব গ্লোবাল হেলথ, ডিসেম্বর ২০১৯)

আর করোনা আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটেছে ইতালিতে। কারণ সেখানে জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বেশি মানুষের বয়স ৬৫-র উর্ধ্বে এবং ইতালিতে প্রতি বছর ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় ১৭ হাজার মানুষ! (ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনফেকশাস ডিজিজ, ভলিউম ৮৮, নভেম্বর ২০১৯)।

আসলে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক তরাই প্রচার করে, যারা কোনো না কোনোভাবে এ থেকে লাভবান হয়। আর আতঙ্ক প্রচার এবং মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলারও একটা ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণটা যিনি যত ভালো বুঝতে পারেন, তিনি তত কম আতঙ্কিত হন। অতএব শঙ্কিত নয়, সচেতন হোন।

প্রশ্ন : পরিচিত অনেকেই বাড়তি কেনাকাটা করে ঘর ভর্তি করছেন। আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। এদিকে সন্তানদের স্কুল বন্ধ থাকায় ওরা সারাক্ষণই টিভি দেখতে চায়। স্বামীর অফিস ছুটি, তিনি কিছুক্ষণ পর পর টিভিতে খবর দেখেন। সবমিলিয়ে অস্থিরতায় সময় কাটছে। দয়া করে পরামর্শ দেবেন গুরুজী।

উত্তর : চারদিকে এমন কেনাকাটা শুরু হয়েছে যে, বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে! এই যদি হয় আমাদের সচেতনতা, তাহলে মানবিকতা কোথায়? একবারও ভেবে দেখছি না—আমাদের অপরিণামদর্শী এ আচরণের মাশুল দিতে হবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। আমরা যেন সতর্ক হতে গিয়ে স্বার্থপর হয়ে না উঠি। আর যেসব খাদ্যদ্রব্য মানুষ কিনছে, এর অধিকাংশই প্যাকেটজাত, যা অস্বাস্থ্যকর।

দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষ যতটা আতঙ্কিত হচ্ছে, ততটা সচেতন হচ্ছে না। হাচি-কাশির শুদ্ধাচার মেনে চলছেন কজন? পুষ্টিবিদরা বলছেন—এসময় অতি ভাজাপোড়া, চিনিযুক্ত খাবার, কোমল পানীয় ও ধূমপান বর্জন করতে। কিন্তু এসব খাওয়া কি কমেছে? এসবের বিক্রি কি কমেছে?

তাই এখন ঘরে-বাইরে দায়িত্বশীল আচরণ করা এবং শুদ্ধাচারী হওয়াটাই আমাদের কর্তব্য। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চলার পাশাপাশি নিয়মিত প্রার্থনা ও কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করুন। এই সময়টা পারিবারিক একাত্মতা বাড়াতে কাজে লাগান। প্রতি বেলায় একসাথে খান। সন্তানদের সাথে গল্প করুন। তাদের বয়স-উপযোগী চিরায়ত গল্প ও সাহিত্য পড়ে শোনান। আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী ও শুদ্ধাচার বই পড়ুন, সবাইকে নিয়ে আলোচনা করুন। শুদ্ধাচার আত্মস্থ করার জন্যে উপযুক্ত সময় এখন।

আর অস্থিরতা দূর করতে দুই বেলা মেডিটেশন করুন। স্বামী-সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করুন। কখনো কিছু চাপিয়ে দেবেন না, বিরক্ত হবেন না। নিজে শুরু করুন, দেখবেন বাকিরাও অনুপ্রাণিত হবে। অর্থাৎ পুরো পরিস্থিতিতে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগান। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠব।

প্রশ্ন : গুরুজী, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আমার এক প্রতিবেশী মৃত্যুভয়ে এতটাই ভীত যে, নিজের বাসাতেও এক রুম থেকে আরেক রুমে যাচ্ছেন না। পারতপক্ষে কোনোকিছু স্পর্শ করছেন না, কাউকে তার আশেপাশে যেতে দিচ্ছেন না। তাকে কীভাবে আশ্বস্ত করব?

উত্তর : মৃত্যু থেকে কখনো পালানো সম্ভব নয়। আর মৃত্যু যে-কোনো বয়সে যে-কোনো সময় আসতে পারে। কোনো আতঙ্কই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না, উপরন্তু বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। মৃত্যুভয়কে যিনি জয় করতে পারেন, জীবন তাকেই আলিঙ্গন করে।

তাছাড়া ভয়-আতঙ্ক দেহে ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স সৃষ্টি করে, যা স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। আর আমাদের দেশের আট বছরের বালকের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইউরোপ ও আমেরিকার ২৫ বছরের যুবকেরও তা নেই। কারণ আমরা স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে গোসল করি। তারা করে গরম পানিতে। অনেকে আবার এক মাস দুই মাসেও গোসল করে না।

এ কথাগুলোই আপনার প্রতিবেশীকে বুঝিয়ে বলুন। সেইসাথে তার পরিবারের সদস্যদের বলুন—এ নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ নয়; বরং তাকে ইতিবাচক হতে সবাই যেন সহযোগিতা করেন।

একইসাথে তাকে নিয়মিত মেডিটেশন ও ইয়োগা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করুন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের মনোবিদ-শিক্ষক-গবেষক ও *দি ইনসাইট গিওর : চেক্স ইয়োর স্টোরি, ট্রান্সফর্ম ইয়োর লাইফ* গ্রন্থের লেখক ড. জন শার্প সম্প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন করোনা-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা নিরসনে যোগব্যায়াম, মেডিটেশন ও প্রাণায়াম (কন্ট্রোলড ব্রিদিং) চর্চার (হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, ১২ মার্চ ২০২০)।

প্রশ্ন : কোয়ারেন্টিনে বাসায় বড্ড একঘেয়ে সময় কাটছে। আপনি ইন্টারনেট-নেটফ্লিক্স থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কিন্তু বার বার এসব দেখতে ইচ্ছা করে। কী করব?

উত্তর : আসলে কোয়ারেন্টিন বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। এজন্যেই এটাকে আমরা শাস্তি মনে করছি। অথচ এ নীরব সময় প্রত্যেকের জন্যেই আশীর্বাদ হতে পারে। কারণ মানুষ খুব কমই সুযোগ পায় এরকম নির্জন থাকার, একা থাকার।

কোয়ারেন্টিনের ধারণাটি কিন্তু নতুন কিছু নয়। রসুলুল্লাহ (স) হলেন কোয়ারেন্টিনের পথপ্রদর্শক। তিনি এ পরামর্শ দিয়েছেন ১৪০০ বছর আগেই এবং তাঁর সাহাবীরা এ নির্দেশ পালনও করেছেন। ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়াতে প্লেগ দেখা দিল। ওমর (রা) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু উবায়দাকে (রা) সিরিয়া থেকে মদীনায় চলে আসতে বললেন। কারণ ওখানে থাকলে তিনিও আক্রান্ত হতে পারেন।

কিন্তু আবু উবায়দা (রা) বিনয়ের সাথে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন—আমি রসুলুল্লাহকে (স) স্পষ্টভাবেই বলতে শুনেছি যে, ‘যদি কোনো স্থানে মহামারি দেখা দেয়, সেই এলাকায় কেউ প্রবেশ করবে না এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে কেউ বেরিয়েও আসবে না।’ তিনি এবং তার সৈন্যদলের কেউই ওখান থেকে বেরিয়ে আসেন নি। পাশ্চাত্যে কোয়ারেন্টিনের ধারণা আসে এরও ৭০০ বছর পর!

বর্তমানে সার্বিক কল্যাণেই সবাইকে ঘরে থাকতে হচ্ছে। তাই বলে সময়গুলো অলসতায় ভেসে যেতে দেবেন না। প্রতিদিনের একটি সুন্দর রঙিন করে নিন। পরিমিত ঘুম ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হোন। এ সময়টা নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি, মেধা এবং সৃজনশীলতা বিকাশে কাজে লাগান। ঘরের কাজে সহযোগিতা করুন। শিক্ষার্থীরা এ সময়টাকে কাজে লাগান নিজের পড়াশোনায়। অন্যেরা বই পড়া, লেখালেখি, নতুন কোনো ভাষা শেখা, বাগানের যত্ন নেয়া—এ ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকুন।

ক্রিনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা কখনো বিনোদন হতে পারে না। এটা বরং আপনার ক্লান্তি ও অবসাদ বাড়ায় বহুগুণে। কমিয়ে দেয় আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ভেবে দেখুন—করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে ঘরে থাকছেন, অথচ টিভি-স্মার্টফোন-ইন্টারনেটের আসক্তি কেড়ে নিচ্ছে আপনার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, মনোযোগ, ঘুম এবং কর্মোদ্যম। তাই নিজের মনোদৈহিক সুস্থতার প্রতি মনোযোগী হোন।

এ মাসের অটোসাজেশন

কর্মব্যস্ততা দুশ্চিন্তা দূর করে।

আমি সবসময় ভালো কাজে ব্যস্ত থাকব। আমি সুখী হবো।

শিষ্টাচার শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক করা হোক

ডা. নুজহাত চৌধুরী

নভেল করোনাভাইরাস মানুষের আচরণের ত্রুটিগুলো স্পষ্ট করে সামনে নিয়ে এসেছে। মানুষের কিছু আচরণ যা তাকে সভ্য ও সামাজিক জীবনে সহনীয় করে তোলে, সেই আচরণগুলোর ঘাটতি আজ আমাদের এক ভয়াবহ মহামারির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কীভাবে হাত ধুতে হয়, কীভাবে কাশি দিতে হয়, কীভাবে জীবাণু ছড়ায় তার পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। এই লেখা সেটা নিয়ে নয়। এই লেখা আমাদের দেশে সামাজিক জীবনে স্বাভাবিক শিষ্টাচারের অভাবের প্রকটতা নিয়ে।

বলছি ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিষ্টাচারের কথা। বিশ্বের অনেক দেশে এগুলো প্রাইমারি স্কুলে শেখানো হয়। খাবার টেবিলের কিছু আচরণ যাকে টেবিল ম্যানার্স বলে, শৌচাগার ব্যবহারের ভাবতা, সামাজিক পরিবেশে হাঁচি-কাশির কিছু ভদ্রতা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে ‘ধন্যবাদ’ অথবা ‘সারি’ বা ‘দুঃখিত’ অথবা ‘এক্সকিউজ মি’ বা ‘কিছু মনে করবেন না’ বলা, শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের প্রতি যত্নশীল আচরণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মানুষের ক্ষেত্রে এই ভদ্রতার শিক্ষাগুলোর মারাত্মক ঘাটতি আছে। না পরিবারে, না শিক্ষাক্ষেত্রে কোথাও এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় না। আমরা যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলি, কফ-থুতু-পানের পিক যত্রতত্র ফেলা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমি এমন করতে দেখলেই আমার চাকরিক্ষেত্রে প্রতিবাদ করি এবং বোঝানোর চেষ্টা করি যে, আপনার থুতুতে যে জীবাণু আছে তা আশেপাশের মানুষের ক্ষতির কারণ হবে। খুব কম ক্ষেত্রেই আমি কাউকে দুঃখিত হতে দেখি। বরং তারা অবাক হয়ে আমার দিকে এমনভাবে তাকান যেন আমি শুধু শুধুই গায়ে পড়ে বগড়া করছি। আবার অনেকে উল্টো তেড়ে আসেন। একবার একজন জিজ্ঞেস করল, ‘থুতু এলে কী করব? গিলে ফেলব?’ কী অদ্ভুত! সেটাও বলে দিতে হবে। সামনে আসছে রোজার মাস। এই থুতু ফেলার বিষয়টা আরো বাড়বে। কেন এমন করেন তারা, কোন শিক্ষা—আমার জানা নেই।

এই মারমুখী, কিছুতেই ভালো কিছু শিখব না, নিজের ভুল মানব না—এ ধরনের আচরণ আমাদের মধ্যে খুব বেশি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা বিমানগুলোর টয়লেটের দুরাবস্থা যারা দেখেছেন, তারা জানেন আমাদের দেশবাসীর শৌচাগার ব্যবহারের শিষ্টাচারের কী অভাব! আপনি শৌচাগার ব্যবহারের পরে এমনভাবে রেখে আসবেন যেন আপনার পরবর্তী ব্যক্তি আপনার ওপর বিরক্ত না হয়। এ-ক্ষেত্রে তারা প্রান্তিক মানুষ, এই যুক্তি আমি মনে করি না সমর্থনযোগ্য।

সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক করার দাবি করছি। জাপানে প্রথম কয়েকটি বছর শিশুদের মানবিক ও সামাজিক আচরণের শিক্ষা দেয়া হয় বলে শুনেছি। আমাদের দেশে মানবিক শিক্ষা দেয়ার আলাদা কোনো সিলেবাস নেই। আর সামাজিক আচরণের শিক্ষা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তাও আমাদের মাথায় আসে নি বলেই প্রতীয়মান হয়।

নারীকে সম্মান জানিয়ে বাসের সিটটি ছেড়ে দেয়া, বৃদ্ধদের হাত থেকে ভারী বোঝাটি নিয়ে তাকে এগিয়ে দেয়া, ঝককে রাস্তা পার হতে সহায়তা করা—এ ধরনের সামাজিক সভ্যতা আমরা কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে কীভাবে বাচ্চাদের পড়াতে পারি তা ভেবে দেখতে হবে। না হলে আমরা সামাজিক জীবনে সেই অভদ্রতা করে যাব, যা এখন করে চলেছি। নারীদের দেখলে সিট মারা, গর্ভবতী নারীকে ধাক্কা মেরে লাইন ভেঙে বাসে উঠে পড়া, বৃদ্ধদের অসম্মান করা, পুরুষ হয়ে নারীদের সিটে বসে যাওয়া আর কেউ কিছু বললে সম-অধিকার নিয়ে মুখ খিঁচড়ে যুক্তিহীন কুতর্ক করা—এসব সামাজিক শিষ্টাচারবিরোধী ব্যবহার আমাদের দেশে সাধারণ ঘটনা।

এমন নিম্নবর্গের অসামাজিক প্রাণী থেকে মানবিক বোধসম্পন্ন রুচিশীল মানুষ হিসেবে জাগ্রতভাবে আমরা যদি উন্নত হতে চাই, তবে প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষার সিলেবাসে সুচিন্তিতভাবে এই বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চলুন না, আমাদের

পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের চেয়ে রুচিশীল মানবিক সভ্য মানুষ করে গড়ে তুলি।

আচরণের সভ্যতা দেখলেই আমরা ধরে নিই তিনি ভালো পরিবার থেকে এসেছেন, ভালো শিক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু তা-ও যেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ। দুঃখ মনে নিয়েই স্মরণ করছি, আমার এক শিক্ষিকা ছিলেন যিনি ক্লাস নিতে নিতে অনবরত নাক খুঁটতেন। বিভীষিকার মতো এই স্মৃতি আমার মস্তিষ্কে রয়ে গেছে কারণ, আমি তার ঐ আচরণের জন্য ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারতাম না। আমার খালি ভয় হতো, কখন তিনি আমার বেঞ্চের সামনে চলে আসবেন, আর আমার বেঞ্চটা ছুঁয়ে দেবেন ঐ হাত দিয়েই। ভাবতে আমার এখনো গা গুলিয়ে আসে।

ভাবুন তো, আপনার কোনো আচরণের জন্যে যদি আপনাকে এভাবে কেউ মনে রাখে! কী দুঃখজনক, তাই না? তেমনি, অনেক শিক্ষিত মানুষ, বড় বড় অফিসার আমি দেখেছি যারা মুখের ওপর কাশি দেন। করোনাভাইরাসের কারণে এই ব্যাপারটা খুব আলোচিত হচ্ছে। সরকারি ব্রিফিং-এ কাশির শিষ্টাচার বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। ‘কাশির শিষ্টাচার’ এই কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আসলেই কাশির শিষ্টাচার আমাদের দেশে বিরাট বড় একটি সামাজিক প্রয়োজন।

শুধু এখন এই করোনা মহামারি প্রতিরোধেই নয়, অন্য মানুষকে সম্মান করে তার পরিচ্ছন্নতার বাধা যেন আমি না হই, আমার আচরণের জন্যে অন্য মানুষ যেন রোগাক্রান্ত না হন, আমি যেন কারো বিরক্তির কারণ না হই—এ রকম দায়িত্বশীলতার সাথে ভাবাটাই সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার। এটা যেন সবাই হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করে তার জন্যেও ‘কাশির শিষ্টাচার’-এর কথা বার বার বলা দরকার ও অভ্যাস করা দরকার। করোনাভাইরাসের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে বাংলাদেশিরা যদি ‘কাশির শিষ্টাচার’-টুকু অন্তত শেখে তো সেটাও অনেক বড় অর্জন হবে।

সেদিন বিদেশি এক চ্যানেল দেখছি। সেখানে একটি কলেজ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ছাত্রের সাক্ষাৎকার নিয়ে করোনাভাইরাসের মহামারির বিষয়ে তাদের মন্তব্য শুনছিলাম। মাস্ক পরা এক ছাত্র বলছিল, তার সবচেয়ে বড় চাওয়া, সে নিজে যেন অন্য কারো ক্ষতির কারণ না হয়। সে কারণেই সে মাস্ক পরেছে এবং অনেকেই এই মনোভাব ব্যক্ত করছিল। আমার খুব ভালো লেগেছে তাদের চিন্তার ধারাটি। আমরা নিজেদের মৃত্যুর ভীতিতে মাস্ক পরে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে ঘুরছি। আমার যেন কিছু না হয় এই শুধু আমাদের চিন্তা। আমাদের থেকে অন্য কারো যেন কিছু ক্ষতি না হয়,

তা কিন্তু আমরা ভাবছি না। একবার যদি সকলে ভাবত, তবে রাস্তায় আর কেউ থুতু ফেলত না। তেমনিভাবে রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ময়লা বর্জ্য ফেলত না। ভাবতেই অবাক লাগে, আমাদের অন্যদের বিষয়ে কোনো দায়িত্ববোধই নেই। এত স্বার্থপর হয়ে আমরা কত দিন ভালো থাকব? একা কি ভালো থাকা সম্ভব? কখনোই না।

খুব বড় একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি সকলে। চলুন না, এর থেকে বড় একটি শিক্ষা নিয়ে নিজেদের পূর্বের চেয়ে উন্নত করে তুলি। করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে এসেছে দেখে আমাদের টনক নড়েছে। এ-ছাড়াও আরো কত ভাইরাস আছে, জীবনসংহারী কত ব্যাকটেরিয়া আছে! আমাদের দায়িত্বজ্ঞান বিবর্তিত, স্বার্থপর, অপরিণীলিত, অসভ্য আচরণ আমাদের পুরো সমাজকে সর্বক্ষণই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। করোনার মহামারির মতো সবসময় তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান না হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তার ঝুঁকি কম কিছু নয় আমাদের নিজেদের জন্যে, অন্যদের জন্যে। চলুন, সবসময় সেই শিষ্টাচারের চর্চা করি, নিজেদের সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি।



শুদ্ধাচারী হোন সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ুন

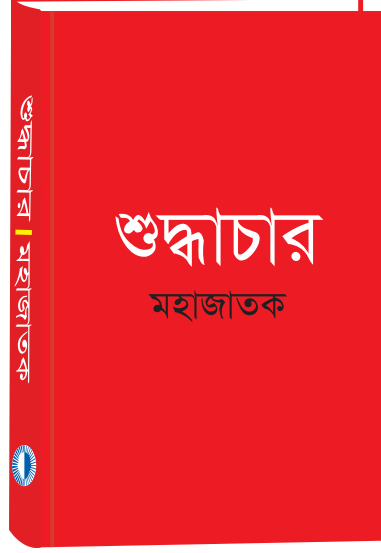
অর্থনৈতিকভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার সাথে তাল মিলিয়ে জাতিগতভাবে নৈতিকতায়, মনুষ্যত্বে, মানবিকতায় ও শুদ্ধাচারে এগোচ্ছি কি? দেশের নিম্নআয়ের মানুষটিও পকেটে নিয়ে ঘুরছে আধুনিক প্রযুক্তিপণ্য। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সমস্ত আয়-সঞ্চয় টেলে দিচ্ছে সন্তানের শিক্ষার জন্যে। উচ্চবিত্তরা উন্নত বিশ্বের নানা দেশ ভ্রমণ করছেন হরহামেশাই। শ্রেণি-পেশা-শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য থাকলেও সমাজে একটা জায়গায় মিল পাওয়া যায় সহজেই। তা হলো, জীবনকে সুস্থ-সুন্দর করার জন্যে মৌলিক করণীয়-বর্জনীয়গুলো অনেক সময় অজানাই থেকে যাচ্ছে।

এজন্যেই প্রয়োজন ‘শুদ্ধাচার’ বইটি। বাংলা ভাষায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার বা শুদ্ধাচার-সংক্রান্ত সংকলন এই প্রথম। এবছর অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে বইটি পৌঁছে গেছে হাজার হাজার পরিবারে।

কোয়ান্টাম প্রকাশিত এ বইটি পড়ে যে-কেউ অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারবেন ভালো ও কল্যাণকর আচরণগুলো। পরিবারের সবাই মিলে বইটি পাঠ করুন, চর্চা করুন। শুদ্ধাচারের সম্মিলিত অনুসরণের মধ্য দিয়ে আপনি সুস্থ থাকবেন, প্রশান্তিতে থাকবেন। এভাবেই কল্যাণ ভরস ছড়িয়ে পড়বে পরিবার, সমাজ ও দেশে। তুলে ধরা হলো নিত্যদিনের অনুসরণীয় কিছু শুদ্ধাচার।

দেহ-মনের সুস্থতার জন্যে

- সুন্দর প্রত্যাশা ও প্রত্যয় নিয়ে দিন শুরু করুন। ঘুম ভাঙতেই বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ/খ্যাৎকস গড/ হরি ওম বা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ, একটি নতুন দিনের জন্যে।
- সুস্থ জীবনদৃষ্টি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিমিত আহার, পর্যাপ্ত পানি পান, মেডিটেশন, দমচর্চা ও ইয়োগা চর্চা করুন।
- সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত পরিচ্ছন্নতা। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে আপনার প্রথম কাজ হোক—সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত-পা পরিষ্কার করা।
- হাঁচি-কাশি যথাসম্ভব নীরবে দিন, রুমাল/ টিস্যু পেপার ব্যবহার করুন। না থাকলে কনুই অথবা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দিন। তারপর হাত ধুয়ে নিন।
- টিস্যু পেপারের পরিবর্তে রুমাল ব্যবহারে অভ্যস্ত হোন। ব্যবহৃত রুমাল প্রতিদিন পরিষ্কার করুন।
- স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক পরামর্শ অনুসারে ঘুম থেকে উঠে নাশতার আগে এবং রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ করুন।
- প্রতিদিন গোসল করুন। নিয়মিত স্বাভাবিক ঠান্ডা পানিতে গোসল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পরে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন।
- নিয়মিত ত্বক ও চুলের যত্ন নিন। সণ্ঠা ছেঁবে কমপক্ষে একবার নখ কাটুন। দাঁত দিয়ে নখ কাটবেন না।



- চোখের কোণের ময়লা, মুখ ও ঘামের দুর্গন্ধের ব্যাপারে সচেতন থাকুন।
- রাস্তাঘাটে, যেখানে-সেখানে থুতু, কফ ও সর্দি ফেলবেন না।
- বাথরুম/ টয়লেট এমনভাবে ব্যবহার করুন যেন তা অন্যদের ব্যবহার উপযোগী থাকে। ব্যক্তিগত বাথরুম নিজ উদ্যোগে নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
- অসুস্থতার কথা কম বলুন। সবসময় বলুন—আমি সুস্থ হবো, সুখী হবো।
- নিজের পছন্দমতো ওষুধ খাবেন না। ওষুধ নেয়া বন্ধ করে দেবেন না। রোগের উপসর্গে মিল থাকলেও অন্যের প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করবেন না। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- ধ্যান, দোয়া, দান ও দাওয়া নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। সুস্থতার জন্যে এ চারটির সমন্বয় করুন।

খাবার গ্রহণে শুদ্ধাচারী হোন

- অতিরিক্ত তেল-ঝাল-মসলাসমৃদ্ধ খাবার বর্জন করুন।
- খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামবেন না। খাবার অপচয় করবেন না।
- যথাসম্ভব মৌন থেকে খাবার গ্রহণ করুন।
- প্রার্থনা খাবারের তৃপ্তি বাড়ায়। খাওয়ার আগে প্রার্থনা করুন এবং খাওয়া শেষে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন

- যত্রতত্র নয়, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলুন। বাসায়, অফিসে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, রেস্টুরেন্টে পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখুন।

- বারান্দা ও জানালা দিয়ে কোনো ময়লা, পানের পিক, কুলি, থুতু ফেলা থেকে বিরত থাকুন।
- বাড়ির আশেপাশে কোনো গর্ত, নারিকেলের খোল, ফুলের টব, ভাঙা প্লেট, গ্লাস ইত্যাদিতে পানি জমে থাকলে পরিষ্কার করুন।

নিয়ম অনুসরণে

- যে স্থানের যে নিয়ম ও আদব তা অনুসরণ করুন।
- জাতীয় সংগীত বাজানো হলে পুরো সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করুন।
- ব্যাংকের কাউন্টার, বাস বা লিফটে ওঠার জন্যে নির্ধারিত লাইনে দাঁড়ান।
- ‘নিয়ম অন্য সবার জন্যে, আমি নিয়মের ব্যতিক্রম’—এটা ভাববেন না। নিজেকে নিয়মের উর্ধ্বে মনে করলেই অহম ও হঠকারিতার চোরাবালািতে ডুবে নিজের সর্বনাশ ঘটাবেন।

সন্তানকে মনোযোগী সময় দিন

- সন্তানের সুন্দর বিকাশে মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যের কোনো বিকল্প নেই। ফেসবুক, ইন্টারনেট, প্রযুক্তিপণ্য থেকে নিজে দূরে থাকুন, শিশুকেও দূরে রাখুন। সন্তানকে মনোযোগী সময় দিন।
- টিভি বা কোনো ধরনের স্ক্রিন দেখিয়ে শিশুকে খাবার খাওয়াবেন না।
- শিশুকে ভালো ও সজন্যশীল কাজে যুক্ত করুন। বই পড়া, গণিত শেখা, লেখালেখি/ ছবি আঁকার জন্যে বই, সুন্দর খাতা, রঙ পেন্সিল কিনে দিন।
- বয়স অনুযায়ী ঘরের কাজগুলোতে সন্তানকে সম্পৃক্ত করুন। এতে সে পরিবারের অংশ হয়ে বেড়ে উঠবে।
- সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করুন।
- দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বীরত্বগাথা সম্পর্কে শিশুকে ধারণা দিন। সে যে এক মহান জাতির উত্তরসূরি—এ প্রত্যয় তার মনে গেঁথে দিন।

অনলাইন আসক্তি থেকে মুক্ত হোন

সময়কে কাজে লাগান রুটিন অনুসারে

- প্রযুক্তি ব্যবহার করুন শুধু প্রয়োজনে। যখন-তখন নয়, ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন।
- সময় কাটানোর জন্যে অনলাইন বিনোদনের ফাঁদে না পড়ে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য করার জন্যে সময়টাকে ব্যবহার করুন।
- সত্যতা নিশ্চিত হওয়া ছাড়া অনলাইনে কোনো তথ্য/ ছবি/ ভিডিও দেখেই বিশ্বাস করবেন না। হুজুগে মেতে উঠবেন না।
- রাত ১১টায় সব ধরনের স্ক্রিন বন্ধ করে দিন।
- একটাই জীবন আপনার। তাই জীবনের সময়গুলো ব্যয় করুন আপনার সার্বিক কল্যাণে এবং রুটিন অনুসারে।